গাজায় প্যালেস্টাইনী জনগণের উপর মার্কিণ - ইসরায়েলী গণহত্যার বিরুদ্ধে সরব হউন

গুরুপ্রসাদ কর

গাজায় গত বছরের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে মার্কিণ সরকারের সরবরাহ করা বিমান, ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলী হানাদারেরা গাজায় যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ শুরু করেছে তাতে ইতিমধ্যেই ১১০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এবং যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে মহিলা ও শিশুর সংখ্যাই বেশি। ২৭শে ডিসেম্বর মাঝ বেলায় হটাৎ গাজার আকাশে মার্কিণের সরবরাহ করা এক ঝাঁক যুদ্ধ বিমান আকাশে উড়তে দেখা গেলো। সেই যে বোমা ও মিসাইল নিয়ে গাজার নিরস্ত্র মানুষের উপর আক্রমণ শুরু হলো তা এখনও বন্ধ হয় নি। মার্কিণের সরবরাহ এফ-১৬ যুদ্ধ বিমান ও আপাচে হেলিকপ্টার থেকে যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ শুরু হলো তা যে মার্কিণ মদতেই ঘটছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। ২৪ ঘন্টার মধ্যেই গাজার ৩০০ মানুষ নিহত হলেন।

২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারী গাজায় ইসরায়েলী মিসাইল হানায় নিহত ৫ ব্যক্তি

এমন একটি শান্ত সময়ে এই আক্রমণ শুরু হয়েছে যখন বহু মানুষজন রাস্তায় ঘোরাফেরা করছিলেন, শিশুরা স্কুল থেকে বাড়ী ফিরছিলো, মহিলারা বাজার করতে বেরিয়েছিলেন। এরকম একটি সময়ে কোনরকম সঙ্কেত না দিয়ে নির্বিচারে বোমা বর্ষন শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে গাজা সহরে দেখা যায় বিদ্ধস্ত ঘরবাড়ী, সাইরেনের আওয়াজ, রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিন্নভিন্ন মানবদেহ। সন্ধ্যায় সহরের প্রায় প্রতিটি রাস্তায় দেখা যায় শবদেহ নিয়ে মিছিল। যে মার্কিণ ও ব্রিটিশ সরকার টেরোরিজ্‌ম-এর বিপদের কথা বলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিচ্ছেন তাদের কাছে কিন্তু ইসরায়েলের এই নির্বিচার হত্যাকান্ড কোন আক্রমণ নয়, আত্মরক্ষা মাত্র।

২০০৯ সালের ৪ই জানুয়ারী গাজায় ইসরায়েলী বোমায় নিহত ৩ শিশুকে নিয়ে শবযাত্রা

ইসরায়েলের আগ্রাসনকারী শাসক তার এই আক্রমণের পক্ষে এই যুক্তি দিচ্ছে যে গাজা থেকে হামাস সদস্যরা ইহুদি বসতি লক্ষ্য রকেট নিক্ষেপ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই আগ্রাসনের আগে পর্যন্ত গাজা থেকে ঘরে তৈরী রকেটের আঘাতে গত ৭ বছরে ১৪ জন ইসরায়েলীর মৃত্যু হয়েছে যেখানে এই একই সময়কালে ইসরায়েলী আক্রমণে ৫০০০ প্যালেস্টিনীয় জনগণ নিহত হয়েছেন।

ফসফরাস বোমা দিয়ে গাজায় ইসরায়েলী বিমান আক্রমণ

সম্প্রতি যে কালো মানুষটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন সেই বারাক ওবামা তার নির্বাচনী প্রচারে বলেছিলেন, ‘‘কেউ যদি আমার বাড়ীতে রাতে রকেট নিক্ষেপ করে যেখানে আমার দুই মেয়ে ঘুমোচ্ছে, তা হলে সেটা থামাতে আমার সাধ্যের মধ্যে যা আছে আমি সব করবো।’’ আসলে বারাক ওবামা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তুলেছেন। আর তিনি মার্কিণ প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছেন তার কারণ তিনি আসলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কালো মানুষ সহ বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন না, প্রতিনিধিত্ব করেন মার্কিণ একচেটিয়া পুঁজির আর তাই এই পুঁজির স্বার্থে যে আগ্রাসী মার্কিণ নীতি বলবৎ রয়েছে তাকেই তিনি এগিয়ে নিয়ে যাবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৬৭ সাল থেকে ইসরায়েল গাজাকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে সেখানকার জনগণকে যে করুণ অবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য করেছে তা ইহুদিদের উপর নাৎসীদের জঘন্য অত্যাচারের কথাই মনে করিয়ে দেয়। গাজার ৮০% অধিবাসী দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। সেখানকার ৯৭% কারখানা ও ফ্যাক্টরী অচল থাকে। ৫০% মানুষ বেকার। ২০০৬ সালে ইসরায়েলী আগ্রাসনকারীরা গাজার একটিমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটিকেও গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পানীয় জলের সঙ্কট ভয়াবহ। আর ইসরায়েলী বাহিনীর অবরোধে সেখানে জীবনদায়ী ঔষধ মেলা ভার।গাজার এই অবস্থাটিকে অনেকেই নাৎসীদের গ্যাস চেম্বারের সাথে তুলনা করেছেন যে গ্যাস চেম্বারে হিটলারের বাহিনী ইহুদিদের বন্দী করে রেখেছিল।
যদিও প্যালেস্টাইন জনগণের উপর এবারের এই আক্রমণ বিরাট ভয়াবহ, কিন্তু এই ধরণের আক্রমণ সেই ১৯৪৬ সাল থেকেই চলে আসছে। আর প্রতিবার আক্রমণ চালিয়ে ইসরায়েল এত মানুষকে হত্যা ও বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছে ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। কিন্তু এই আক্রমণের কারণ ও প্যালেস্টাইনী মানুষের স্বাধীনতার লড়াই কে বুঝতে হলে সংক্ষেপে আমাদের ইসরায়েল রাষ্ট্র গড়ে উঠার ইতিহাসটা দেখে নিতে হবে যে ইতিহাসকে খালি মার্কিণ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই নয়, আমাদের সরকার ও বড় গণমাধ্যমগুলিও চেপে রাখার চেষ্টা করে।

আসুন প্রকৃত সত্যকে জানি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ তাদের প্রচার যন্ত্রকে ব্যবহার করে অন্যান্য বিষয়ের মতোই প্যালেস্টাইন অঞ্চলে ইসরায়েল রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে আসছে। তাই আসুন আমরা এই মিথ্যার জালকে ছিন্ন করি। ইসরায়েল রাষ্ট্রের মদতাকরীরা বরাবর এই প্রচার চালিয়ে আসছে যে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের মূল সমস্যা হলো যে প্যালেস্টিনীয় জনগণ ইসরায়েল রাষ্ট্রটিকে সহ্য করতে পারে না। বাস্তব তথ্যকে বিকৃত করে দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে স্বাধীন ভুমির জন্য ঐ অঞ্চলের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই ইহুদি জনগণ ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।
আসলে বিংশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্তও বেশিরভাগ ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাস করতেন। অনেক দেশেই তারা ছিলেন পুঁজিবাদী শাসকদের অত্যাচার ও বৈষম্যের শিকার। একইসাথে এই সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ বিপ্লবী ও অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। আর এই ধারার বিপরীতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রত্যক্ষ মদতে এই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এক সঙ্কীর্ণ উগ্র ইহুদিবাদের জন্ম হয়েছিল। এই ধারার প্রবক্তারা প্যালেস্টাইন অঞ্চলে ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের স্বপ্ন দেখাতো যেখানে ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদিদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। এই ধারার এক প্রথম সারির প্রবক্তা থিওডর হার্জল্ বলেছিল,''এশীয়বাসীদের বিরুদ্ধে ইউরোপের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্যালেস্টাইন অঞ্চলে আমরা এমন একটি কেন্দ্র গড়ে তুলবো যা বর্বরতার হাত থেকে সভ্য জগতকে রক্ষা করবার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।
গত দু হাজার বছরের ইতিহাসে প্যালেস্টাইন অঞ্চলে ইহুদি সম্প্রদায় কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। সুদূর অতীতে (প্রথম শতাব্দীর ৭০ দশক নাগাদ) রোম সাম্রাজ্যের কাছে প্যালেস্টাইনের শেষ ইহুদি রাজত্বের পতনের পর এই অঞ্চলের ইহুদিরা ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৮ সালেও যদি প্রকৃত হিসাব নেওয়া হয় তা হলে দেখা যায় যে প্যালেস্টাইন অঞ্চলে প্যালেস্টাইনী অধিবাসীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৮০ হাজার যেখানে ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ৫৬ হাজার। প্যালেস্টাইনীয় মানুষ ঐ অঞ্চলের ৯৭ শতাংশ জায়গা জুড়ে বাস করতেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্য পরিকল্পনা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আটোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হলে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্যালেস্টাইন সহ এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত অঞ্চলগুলির উপর আধিপত্য তৈরী করবার চেষ্টা করে। আর এই অঞ্চলগুলি তাদের কাছে লোভনীয় ছিল কারণ ততদিনে খনিজ তেল অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে যা মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের বিশেষ সম্পদ। ব্রিটেন তখন হিসেব করেছিল যে দক্ষিন আফ্রিকার মতো প্যালেস্টাইন অঞ্চলেও

১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন থেকে থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ লেবাননের পথে

যদি ইহুদি জঙ্গীবাদীদের একটি রাষ্ট্র তৈরী করা যায় তা হলে মধ্যপ্রাচ্যে প্রভুত্ব বজায় রাখার কাজটি সহজসাধ্য হবে। ব্রিটেনের আরও একটি লক্ষ্য ছিল যাতে সদ্য গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন ইহুদি সম্প্রদায়ের সমর্থন না পায় সেটা সুনিশ্চিত করা। আর এই লক্ষ্যে সেই ১৯২২ সাল থেকেই ব্রিটিশ এই অঞ্চলে বসবাসে জন্য বাইরের ইহুদিদের মদত করে চলে।

ব্রিটিশ মদতে প্যালেস্টাইন অঞ্চলে এইভাবে ইহুদি বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনের মানুষও সংগ্রাম গড়ে তোলে। ১৯৩৬ সালে এখানে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু হয় যা ব্রিটিশ ১৯৩৯ সালে নির্মমভাবে দমন করে। সেইসময় জঙ্গী ইহুদিবাদী এক নেতা লিখেছিল, ''আমরা যেন নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে এই সত্যকে না ভুলে যাই যে রাজনৈতিকভাবে আমরা হচ্ছি আগ্রাসক আর তারা (প্যালেস্টাইনীয় জনগণ) নিজেদের অধিকারের পক্ষে লড়াই করছে।... দেশটা হচ্ছে তাদের, কারণ তারাই এখানকার বাসিন্দা যেখানে আমরা এখানে বাইরে থেকে এসে বসতি স্থাপন করতে চাই, আর তার ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আমরা তাদের দেশ কেড়ে নিতে চাইছি।'' ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটেন ও তার সহযোগী মার্কিণ সরকার তাদের নিজেদের দেশে ইহুদিদের খুব বেশি ঢোকার সুযোগ দেয় নি।

১৯৪৮ সালে ইসরায়েলী আক্রমণে বিধ্বস্ত বাসা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি আক্রমণে ইউরোপে যখন ইহুদিরা বিপর্যস্ত হয়ে আশ্রয়ের খোঁজ করছে তখন কৌশলে তাদের প্যালেস্টাইন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য মদত করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসাবে আবির্ভূত হয়, আর তাই স্বাভাবিকভাবেই মধ্যপ্রাচ্যেও সে ব্রিটিশকে টপকে তার নিজের অধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্যালেস্টাইন অঞ্চলকে দু টুকরো করে ইসরায়েল রাষ্ট্র ও একটি আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার প্রস্তাব পাশ করা হয়। তখন পর্যন্তও এই অঞ্চলে প্যালেস্টাইনীয় জনগণের সংখ্যা ইহুদিদের তুলনায় ছিল দ্বিগুন এবং তারাই ঐ অঞ্চলের ৯২% জায়গা জুড়ে বসবাস করতো। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাবে ইসরায়েলকে ৫৪% অঞ্চল দিয়ে দেওয়া হয়।

আরব দেশগুলি রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করলে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ইহুদি জঙ্গীবাদীরা ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম ঘোষনা করে প্যালেস্টাইনী মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। দার ইয়াসিন গ্রামে ইসরায়েলী হানাদারেরা ২৫০ জন নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে যার মধ্যে ১০০ জন ছিল নারী ও শিশু। ইসরায়েলী বাহিনী প্যালেস্টাইনীয় জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতে এই বর্বর হত্যাকান্ড চালায় আর তার ফলে প্রচুর মানুষ ঘরবাড়ী ছেড়ে পালায়। ১৯৪৯ সালে যুদ্ধ শেষ হলে দেখা যায় যে প্যালেস্টাইনীয় জনগণের দুই তৃতীয়াংশ তথা ৮ লক্ষ মানুষ নিজভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে লেবানন, জর্ডন, সিরিয়া, গাজা, এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। ইসরায়েল ঐ অঞ্চলের প্রায় ৭৭% জমি দখল করে নিয়েছে।

১৯৪৮ সালের যুদ্ধের পর থেকে ইসরায়েল পরিকল্পিতভাবে প্যালেস্টাইনীয় সমাজ তথা তাদের গ্রাম, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং সামাজিক পরিকাঠামো ধ্বংস করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৮৮ সাল নাগাদ দেখা যায় যে ১৯৪৮ সালের সীমানা অনুযায়ী যে অঞ্চল প্যালেস্টাইনীয়দের হাতে ছিল সেই অঞ্চলের মোট ৪৭৫টি গ্রামের মধ্যে ৩৮৫টি ইসরায়েল ধ্বংস করে ফেলেছে। ইসরায়েলী নেতা মোসে দায়ান স্বীকার করে বলেছিল, ''এমন একটিও ইহুদি গ্রাম নেই যা প্যালেস্টাইনীয় গ্রামকে ধ্বংস করে তৈরী করা হয় নি।

১৯৪৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ইসরায়েল কর্তৃক প্যালেস্টাইনীয় বাসভূমি দখল

১৯৪৬ — ১৯৪৯-১৯৬৭ — ২০০০

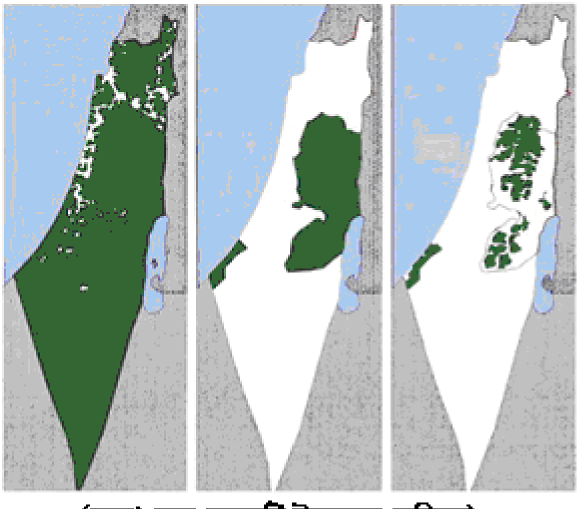

(ম্যাপে সাদা অঞ্চলটি ইসরায়েল অধিকৃত)

১৯৬৭ সালে মার্কিণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ইসরায়েল আরোও অঞ্চল দখল করতে ও নিজেকে একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ৬ দিন ধরে

আরব দুনিয়ার বিরুদ্ধে এক বীভৎস আক্রমণ চালায়। এই আগ্রাসী যুদ্ধে ইসরায়েল ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইনের বাকী ২৩% অঞ্চল অর্থাৎ ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, গাজা, পূর্ব জেরুজালেমের সাথে সিরিয়ার গোলান হাইট ও মিশরের সিনাই পেনিনসুলা দখল করে নেয়। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পরে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ২৪২ নং যে প্রস্তাব গৃহিত হয় তাতে ইসরায়েলকে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দখলীকৃত অঞ্চল ফিরিয়ে দেবার কথা বলা হয় এবং তার পরিবর্তে আরব রাষ্ট্রগুলিকে ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেবার কথা বলা হয়। ইসরায়েল দখলীকৃত অঞ্চলগুলি থেকে সরে আসার বদলে সেখানে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সামরিক ঘাঁটি ও ইহুদি বসতি স্থাপনের কাজ চালিয়ে যায়। সেই থেকে গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে প্যালেস্টাইনীয় মানুষ তাদের সমস্ত স্বাধীনতা হারিয়ে ইসরায়েলী সামরিক ঘেরাটোপের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। ১৯৮৮ সাল নাগাদ দেখা যায় যে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের ৫২% ও গাজার ৩০% অঞ্চল ইসরায়েলী নাগরিক ও সৈন্যবাহিনীর দখলে চলে গেছে আর প্যালেস্টাইনী জনগণের হাজার হাজার ঘরবাড়ী ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ১৯৮২ সালে ইসরায়েল আবার লেবানন আক্রমণ করে এবং নির্বিচারে গণহত্যা চালায় যার ফলে প্রায় ২০ হাজার লেবানীস ও প্যালেস্টাইনীয় শরনার্থীর মৃত্যু হয়।

মার্কিণ স্বার্থেই ইসরায়েলের সৃষ্টি

ইতিহাস থেকে আমরা দেখেছি যে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হওয়ার পর থেকে সে যেমন দুনিয়া জুড়ে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে তার পাশাপাশি এই ব্যবস্থা বজায় রাখতে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করেছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে যথাসম্ভব মদত করেছে। পুঁজিবাদের এই পরিনতি আসলে তার অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশের মধ্যেই নিহিত। একচেটিয়া ব্যবস্থা দেখা দেবার পরে আর সে মুক্ত প্রতিযোগিতা ও গণতন্ত্রের বিকাশের পক্ষে থাকে না, যে কোনভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য লুন্ঠণ করাই হয়ে ওঠে তার মূল কর্মসূচী। অন্য সমস্ত কর্মসূচী হয়ে ওঠে একচেটিয়া পুঁজির উদ্বৃত্ত লুন্ঠণের কর্মসূচীর অধীন। তাই রাজনৈতিক আধিপত্য হচ্ছে একচেটিয়া ব্যবস্থার এক আবশ্যিক অঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সরাসরি উপনিবেশ বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়তে শুরু করে, তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আধিপত্য বজায় রাখার জন্য যে হীন কৌশলগুলি গ্রহণ করেছিল মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম। আর এর জন্য সে বেছে নিয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল উগ্র ইহুদিবাদী মতাদর্শকে মদত করার অপকৌশল। এই প্রক্রিয়া প্রথম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শুরু করলেও পরবর্তীতে শক্তিশালী হয়ে ওঠা মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় চলে আসে। আসলে ইসরায়েল রাষ্ট্রটি মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিণ আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তার এক বিশেষ সামরিক ঘাঁটি হিসাবে কাজ করে। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল যেখান থেকে আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার উপর নজরদারী বজায় রাখা যায় এবং সর্ব্বোপরি আরবের তৈলসমৃদ্ধ অঞ্চলের উপর খবরদারী করা যায়। এই কারণে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বছরে ইসরায়েলকে ২ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার সাহায্য করে আসছে। আর এই সাহায্যের ফলে ইসরায়েল আধুনিক মারণাস্ত্রে মারাত্মকভাবে সুসজ্জিত হয়ে নিজেকে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে ক্রমাগত প্যালেস্টাইনীয় জনগণকে নিশ্চিহ্ন করবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসরায়েল রাষ্ট্রটির জন্মের ইতিহাস দেখায় যে ঐ অঞ্চলে প্যালেস্টাইনী জনগণের পাশাপাশি কিছু ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস থাকলেও তা কখনো ঐতিহাসিকভাবে আরব জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন হিসাবে দেখা দেয় নি এবং দেখা দেবার কোন কারণও ঘটেনি কারণ বেশিরভাগ ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষ ক্রমে ক্রমে এখান থেকে ইউরোপে চলে গেছেন এবং বাকীরা এই অঞ্চলের অন্যান্য মানুষের সাথে মিশে যাবার প্রক্রিয়াতে ছিলেন। যেহেতু কেবলমাত্র আরব অঞ্চলে আধিপত্য বজায় রাখবার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই রাষ্ট্রটির জন্ম দিয়েছে, তাই এই রাষ্ট্রটির বিলোপ সাধন না ঘটিয়ে এই অঞ্চলের প্যালেস্টাইনীয় মানুষের স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না। একমাত্র এই জঙ্গী ইহুদি রাষ্ট্রটির বিলোপ ঘটিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই একদিকে যেমন প্যালেস্টাইনীয় জনগণে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে তেমনি তা সাধারণ ইহুদি ধর্মাবলম্বী মানুষেরও শান্তি সুনিশ্চিত করতে পারে।

ভারত সরকারের নির্লজ্জ মার্কিণ ঘেঁষা বিদেশনীতি

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে যাবার পর তৎকালীন সময়ে বিশ্বে শক্তিশালী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উপস্থিতি ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তি বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার আপাতভাবে একটি জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করতে পেরেছিল। আর তার ফলে সরকারিভাবে ভারতের অবস্থান ছিল প্যালেস্টাইনীয় জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে। নৈতিকভাবে যতটা নয় তার চেয়ে কৌশলগতভাবে এই অবস্থান বজায় রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল যতদিন সোভিয়েত বৃহৎ শক্তি হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাল্লা দেবার অবস্থায় ছিল এবং ভারতীয় শাসকবর্গ সোভিয়েত শাসকদের ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু ১৯৮০'র দশক থেকে সোভিয়েতের দুর্বল হয়ে পড়া ও ভারতীয় শাসকদের উগ্র হিন্দুবাদী মতাদর্শ গ্রহণ করার প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় শাসকদের পুরনো অবস্থান বদলের দিকে নিয়ে যায়।

১৯৯০ থেকেই ভারত সরকার তার জোট নিরপেক্ষ নীতি থেকে সরে যেতে থাকে। সরকার মনে করে যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার আর তার জন্য তারা ইসরায়েলের ব্যাপারেও পুরনো অবস্থানকে পরিবর্তনের ভাবনা চিন্তা শুরু করে। ১৯৯২ সালের জানুয়ারীতে ভারত সরকার ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়। পরের মাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শারদ পাওয়ার জঙ্গী দমনের ব্যাপারে ইসরায়েল - ভারত সহযোগিতা গড়ে তোলার পদক্ষেপ হিসাবে ইসরায়েলের পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ইয়াকভ লাপিডটকে ভারতে আমন্ত্রণ জানায়। এরপর ভারত ইসরায়েলের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা শুরু করে যার ফলে ইসরায়েলের অস্ত্রশিল্প চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

বিজেপি ক্ষমতায় এসে ওয়াশিংটন ও তেল আবিব উভয়ের সাথেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তোলে এবং মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে এই ত্রয়ীর মিলন বিদেশনীতির প্রধান বিষয় হিসাবে হাজির করে। যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গত শতকের ৪০'র দশক থেকে জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, লাওস, নিকারাগুয়া, এল সালভাদোর, ইন্দোনেশিয়া, পানামা, ইস্ট টিমর, ইরাক, যুগোস্লাভিয়া, গ্রেনাডা সহ আরোও নানান দেশের কয়েক কোটি মানুষকে বর্বরতার সাথে হত্যা করেছে, এবং এখনও করে চলেছে, মার্কিণ মদতে যে ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ১ লক্ষ প্যালেস্টাইনী মানুষকে হত্যা করেছে সেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সাথে সখ্যতা গড়তে ২০০৩ সালের ৮ই মে আমেরিকায় ইহুদি সম্প্রদায়ের কমিটির সামনে ভারতের জাতীয় প্রতিরক্ষা সচিব ব্রজেস মিশ্র বললেন, ''ভারত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কিছু মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। এই তিনটি দেশেই গণতন্ত্র রয়েছে, রয়েছে বৈচিত্র, পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও সমান সুযোগ। ...... এই তিনটি দেশই সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান লক্ষ্য। তাই এই তিনটি দেশের যৌথভাবে আধুনিক সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে হবে।.... আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যবস্তু হওয়াতে গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক সত্যিকারের জোট গড়ে তুলতে হবে।''তবে কেবল কংগ্রেস, বিজেপি নয়, এ রাজ্যের মার্কসবাদী সরকারও বিজেপির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে কম অবদান রাখেন নি। ২০০০ সালে যেমন আদবানী ইসরায়েল সফরে যান তেমনি জ্যোতি বসুও ২৫ জন ব্যবসায়ীর একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ইসরায়েল সফর করেন এবং এই সফরের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে খালি ভারত সরকার নয়, সরকারে থাকা মার্কসবাদীরাও ইসরায়েলের সাথে ব্যবসায়ী ও কূটনৈতিক যোগাযোগ গড়ে তুলতে আগ্রহী। এরপরে ভারত সরকার জঙ্গী দমনে ইসরায়েলী সহায়তা ও ট্রেনিং পাওয়ার জন্য নানা ধরণের চুক্তি করে। ২০০৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ইসরায়েলের একজন উচ্চপদে আসীন সেনাধ্যক্ষ আভি মিরজাই দিল্লীতে অবতরণ করে। জঙ্গী দমন করবার কৌশল সংক্রান্ত আলোচনার জন্য তাকে কেবল কাশ্মীরেই নিয়ে যাওয়া হয় নি, তার সাথে আমাদের বায়ু, জল ও স্থল বাহিনীর সেনাধ্যক্ষরাও দেখা করে।

যে ইসরায়েল সরকার একটি গোটা জাতিকে তার বাসভুমি থেকে নির্মমভাবে উচ্ছেদ করে এক ফ্যাসিস্ত ব্যবস্থা কায়েম করেছে তার সাথে এরকম কূটনেতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ভারত সরকারের এই ধরণের পদক্ষেপ হচ্ছে সমস্ত ধরণের নীতিগত অবস্থান থেকে সরে আসা। আর এই ধরণের পদক্ষেপের ফলে আরব দুনিয়াতে মার্কিণ ও ইসরায়েলের আগ্রাসনে ক্রমাগত পৃথিবী জুড়ে যে উত্তাল বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের জন্ম হচ্ছে তার লক্ষ্যবস্তু মার্কিণ, ইসরায়েলের সাথে সাথে হয়ে উঠবে ভারতও। আবার এই ধরণের বিক্ষোভ বিদ্রোহের মধ্যে থেকে কিছু বিজাতীয় জঙ্গী ক্রিয়াকলাপেরও উদ্ভব হয় যার ফল ভুগতে হবে সাধারণ ভারতীয় নাগরিকদেরও আর তার জন্য দায়ী থাকবে ভারত সরকারের এই নীতি বিবর্জিত কান্ডজ্ঞানহীন বিদেশনীতি।

সাহায্যকারী লেখা :

1) `Israel : A state of occupation, Revolutionary workers', Nov.20, 2000.
2) `Israel unleashes a massacre in Gaza, Larry Everest, Revolutionary workers', Dec.28, 2008.
3) `The fateful triangle', Noam Chomsky (Boston : South End Press, 1983)
4) `India's Reckless Road to Washington Through Tel Aviv', Vijay Prasad, Z- Magazine, Dec.27, 2008.
5) `An eye for an eyelash : The Gaza massacre', David Edwards & David Cromwel, Z - Magazine, 16th January, 2009.